টাইমের বর্ষসেরা ব্যক্তি ফেসবুক প্রতিষ্ঠাতা জুকারবার্গ

গোলাপ মুনীর

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন টাইম ম্যাগাজিন ২০১০ সালের জন্য বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে নির্বাচন করে জনপ্রিয় নেটওয়ার্কিং সাইট ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মার্ক এলিয়ট জুকারবার্গকে। ফেসবুকের বিপুল ব্যবহারের পাশাপাশি মানুষের জীবনে ও বছরের ঘটনাপ্রবাহে এর প্রভাব বিবেচনা করে জুকারবার্গকে এ সম্মান দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় টাইম ম্যাগাজিন। এ বছর ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ফেসবুকের মাধ্যমে এই বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা মানুষের জীবনধারা বদলে দিচ্ছে। মাত্র ৭ বছর সময়ের মধ্যে জুকারবার্গ একটিমাত্র সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৃথিবীর এক-ষাদশাংশ মানুষের মধ্যে সংযোগ গড়ে তুলেছেন। প্রতি ১২ জনে একজন এখন ফেসবুকের সদস্য। ফেসবুকের সদস্য সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। ফেসবুকের সদস্যরা যদি একটি দেশ গড়তে পারত, তবে সে দেশ হতো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দেশ। জনসংখ্যা বিবেচনায় তার উপরে থাকতো শুধু চীন ও ভারত।

এর শুরুটা হয়েছিল অনেকটা মজা করার জন্য। দুষ্টুমির ভাবনা নিয়ে, কিন্তু এখন তা রূপান্তরিত হয়েছে এক বাস্তবতায়। এ বাস্তবতা পরিবর্তন এনেছে মানুষের সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে। সাত বছর আগে ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জুকারবার্গ ছিলেন ১৯ বছরের তরুণ-হার্ভার্ডের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তখন তিনি তার ডরমিটরি থেকে একটি ওয়েবসাইট চালু করেন। নাম দেন TheFacebook.com, বলা হলো এটি একটি অনলাইন ডিরেক্টরি, যা কলেজগুলোর ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ গড়ে তুলবে। এখন এর নাম থেকে the বাদ দিয়ে Facebook নাম দেয়া হয়েছে। চলতি বছরে এ নেটওয়ার্কের সদস্যসংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়ালো। এরা কথা বলে ৭৫টি ভাষায়। এরা সম্মিলিতভাবে প্রতিমাসে ফেসবুকের পেছনে খরচ করে ৭০ হাজার কোটি মিনিট। গত নভেম্বর মাসে আমেরিকার প্রতি ৪টি অ্যামেরিকান পেজ ভিউয়ের মধ্যে ১টি ছিল ফেসবুক পেজ ভিউ। বর্তমানে প্রতিদিন সদস্যসংখ্যা বাড়ছে ৭ লাখ।

আমেরিকার সামাজিক জীবনের পরতে পরতে মিশে গেছে ফেসবুক। শুধু আমেরিকান সামাজিক জীবনেই নয়, গোটা মানবজাতির জীবনের বেলায় একই কথা খাটে। তবে আমেরিকানদের জীবনে এর ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি। অর্ধেক আমেরিকানেরই রয়েছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট। তবে ৭০ শতাংশ ফেসবুক ব্যবহারকারীই বাস করে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে। বিশ্ব সমাজ বাস্তবতায় ফেসবুক আজ এক স্থায়ী ঘটনা। আমরা প্রবেশ করেছি ফেসবুকের যুগে। আর মার্ক জুকারবার্গ হচ্ছেন সেই মানুষ, যিনি তা আমাদের উপহার দেন। উলে-খ্য, টাইম ম্যাগাজিনের জরিপে দেখা গেছে, পাঠকেরা এ বছরের সেরা ব্যক্তি হিসেবে উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান পল অ্যাসাঞ্জের নাম উলে-খ করে। কিন্তু ম্যাগাজিনটির সংবাদদাতা ও সম্পাদকমণ্ডলী নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর জুকারবার্গকে সেরা ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেন। টাইমের তালিকায় জুকারবার্গের নামের পরই আছে অ্যাসাঞ্জের নাম, তার পরে আছেন আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই এবং চিলির ৩৩ খনি শ্রমিক।

মার্ক জুকারবার্গের জন্ম ১৯৮৪ সালে। সে হিসেবে তার বয়স এখন ২৬ বছর। এ বয়সেই তিনি হয়ে উঠেছেন বিশ্বসেরা। তিনি বেড়ে উঠেছেন নিউইয়র্কের ডবস ফেরিতে। বাবা ডেন্টিস্ট আর মা মনোবিজ্ঞানী। জুকারবার্গের বোন তিনজন। সবচেয়ে বড় বোন র‍্যাচি বর্তমানে ফেসবুকের ভোক্তা বিপণন ও সমাজকল্যাণ উদ্যোগ বিভাগের প্রধান। জুকারবার্গের বাবার অভিমত : 'ছোটবেলা থেকেই জুকারবার্গের ইচ্ছাশক্তি প্রবল। কর্মে নিষ্ঠাবান। সে যদি কিছু করতে চাইত, তবে তাতে সায় দিয়ে 'হ্যাঁ' বলাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে 'না' বলতে হলে, এর পেছনে জোরালো যুক্তি তুলে ধরার প্রস্তুতি নিয়েই 'না' বলতে হতো। এই 'না' বলার যুক্তির পেছনে যথেষ্ট তথ্য, অভিজ্ঞতা, যৌক্তিকতা ও কার্যকারণ থাকা প্রয়োজন ছিল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম একদিন সে এমন এক আইনজীবী হবে যে বিচারকদের স্বমতে আনতে প্রায় শতভাগ সাফল্য পাবে।

জুকারবার্গ স্থানীয় একটি হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পর চলে গেলেন নিউ হ্যাম্পশায়ারের 'ফিলিপস এক্সেটার অ্যাকাডেমি'তে। সেখানে তিনি তার শ্রেণিবন্ধুর সাথে মিলে যৌথভাবে লেখেন Synapse নামের একটি মিউজিক রিকমেন্ডেশন প্রোগ্রাম। AOL এবং Microsoft উভয়ই কয়েক লাখ ডলার দিয়ে সে প্রোগ্রাম কিনে নিয়েছিল। কিন্তু জুকারবার্গ প্রোগ্রামটি আরো ডেভেলপ করার জন্য চলে যান হার্ভার্ডে। মা-বাবার একমাত্র ছেলে জুকারবার্গ ছোটবেলা থেকেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন প্রোগ্রামিংয়ে। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতেন কমপিউটার নিয়ে। হাইস্কুলে পড়ার সময় তিনি ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, লাতিন ও প্রাচীন গ্রিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। শুরুতে সাহিত্য ছিল তার পড়াশোনার বিষয়। তবে প্রোগ্রামিং ছিল তার প্রিয় চর্চার বিষয়। তাকে বাবা-মায়ের সহায়তা ছিল পুরোপুরি। ডেভিড নিউম্যান ছিলেন তার কমপিউটার শিক্ষক। শুরু করেন নানা ধরনের গেম এবং বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরির কাজ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর তার এ ধরনের চর্চা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। এসময় তার পড়াশোনার বিষয় হয়ে ওঠে কমপিউটার ও মনোবিজ্ঞান। তবে শিক্ষাঙ্গনের বিষয়ের বাইরে নিজেকে বেশি ব্যস্ত রাখতেন প্রোগ্রাম তৈরির কাজে। এ সময় তার তৈরি দুটি প্রোগ্রাম ছিল কোর্টম্যাচ ও ফেইসম্যাশ। ফেইসম্যাশের কাজ ছিল ভোট দিয়ে হার্ভার্ডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিক্ষার্থী নির্বাচন। প্রোগ্রামটি বেশ জনপ্রিয় হলেও সাথে জুটে কিছু সমালোচনাও। অনেকেই বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করতে শুরু করেন অন্যের ছবি। মার্ক জুকারবার্গ এ দুটো প্রোগ্রাম তৈরি করেই থেমে থাকেননি। হার্ভার্ড থেকে বিতাড়িত এ যুবক ভাবতে থাকেন এমন এক সাইটের কথা, যেখানে মানুষ নিজের অবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ পাবে সহজেই। নিজের ভাবনা, সুখ-দুঃখ প্রকাশ করতে পারবে বন্ধুদের সাথে। পরিচিত হতে পারবে নতুনদের সাথে। বাড়াতে পারবে সামাজিক যোগাযোগের পরিধি। সুপরিচয় হবে বন্ধুত্বের ও সামাজিক সম্পর্কের ভুবন। এ ভাবনা থেকে ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জুকারবার্গ সৃষ্টি করেন ফেসবুক। এটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় সামাজিক নেটওয়ার্ক। আগেই উলে-খ করা হয়েছে, ফেসবুকের সদস্যসংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

জুকারবার্গের হার্ভার্ড ও হার্ভার্ড-উত্তর জীবন বিষয় হয়ে উঠেছে গত অক্টোবরে মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্র 'দ্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক'। এর কাহিনী লিখেছেন অ্যারন সরকিন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডেভিড ফিঞ্চার। এ ছবিতে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এক উদ্যমী, সামাজিকভাবে প্রতিবাদী তুখোড় চরিত্রের সমৃদ্ধ ও নাটকীয় প্রতিকৃতি। এটি সেই চরিত্র, যা মিশে গেছে সত্যিকারের জুকারবার্গের জীবনের সাথে। বাস্তবতা তার চেয়েও জটিল।

তার শারীরিক অবয়ব খুব একটা ছাপ ফেলার মতো নয়। লম্বায় ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। রোমান নাক। মুষ্টিযোদ্ধার মতো বুক। কোঁকড়ানো চুল। পোশাক-আশাক সাধারণ, টি-শার্ট আর জিনস।

জুকারবার্গ ফেসবুক শুরু করেছিলেন এমন একটি উপায় হিসেবে যাতে করে কলেজ ক্যাম্পাসের সবাই একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারে। পুরনো দিনের সোশ্যাল ▸

নেটওয়ার্ক ছিল 'ফ্রেন্ডস্টার' ও 'মাইস্পেস' ধরনের। কিন্তু ফেসবুক নামের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফেসবুক কোনো শিক্ষাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ফেসবুক বিশ্বজয় করেছে জুকারবার্গ, তার বাবা-মা আর তার রুমমেট ডাস্টিন মস্কোভিটজ আর সিয়ান পার্কার (কো-কাউন্ডার অব Napstar)– সবাই মিলে ফেসবুকের বিশ্বজয়ের ঝুঁকিপূর্ণ অভিযাত্রা শুরু করেন। ২০০৪ সালের শেষ দিকে ফেসবুক বিস্তার লাভ করে যুক্তরাষ্ট্রের করোকশ' কলেজ ক্যাম্পাসে। ২০০৫ সালে তা সম্প্রসারিত হয় হাইস্কুল ও বিদেশী স্কুলগুলোতে। ২০০৬ সালে তা সম্প্রসারিত হয় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এবং সবশেষে ১৩ বছরের চেয়ে বেশি বয়েসী যেকোনো জনের জন্য তা উন্মুক্ত হয়। ফেসবুকের বেড়ে ওঠা বিস্ময়কর। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লাখ। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে এ সংখ্যা গিয়ে পৌঁছে সাড়ে ৩ কোটিতে। আর ২০১০ সালের জুলাইয়ে তা ৫০ কোটি ছাড়িয়ে যায়।

ফেসবুকের এ বেড়ে ওঠার কারণ এটি এমন কিছু দিতে পেরেছে যা মানুষ প্রত্যাশা করেছিল। ফেসবুক সাইবার স্পেসকে করে তুলেছে অনেকটা রিয়েলওয়ার্ল্ড– বাস্তব জগৎ। নিজেকে হলেও সত্য জগৎ। ইন্টারনেটের masked-ball পিরিয়ডের অবসান ঘটতে যাচ্ছে, যেখানে মানুষ যাপন করেছে দ্বৈত জীবন। রিয়েল ও ভার্চুয়াল। এখন আবার যাপন করছে একক জীবন। এর অর্থ এই নয়, মানুষের আকুল আগ্রহ ছিল দৈনন্দিন জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া, বরং আগ্রহটা হচ্ছে আরো গভীর দৃষ্টি দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে সম্পৃক্ত হওয়া।

২০০৫ সালে ইন্টারনেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক মার্কেট হয়ে ওঠে ফটো শেয়ারিং। ফেসবুক এর ফটো শেয়ারিং সার্ভিস চালু করে ২০০৫ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে। ২০০৭ সালের দিকে এসে ফেসবুকের ফটো ট্রাফিকের পরিমাণ Photobucket, Flicker কিংবা Picasa-র পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে ফেসবুক এর সাইটে ১৫০০ কোটি ফটো হোস্ট করে। ফেসবুক ব্যবহারকারীরা এখন প্রতিদিন ১০ কোটির মতো ফটো ফেসবুকে আপলোড করে।

বিভিন্ন ডেভেলপার আজ ফেসবুকের জন্য অ্যাপ্লি-কেশন ক্রিয়েট করে বাজারজাত করছে। এভাবে এসব অ্যাপ্লি-কেশনকে সামাজিক করে তুলছে। এক্ষেত্রে একটি ভালো উদাহরণ হচ্ছে গেম। ফেসবুকে খেলার জন্য গেম ডিজাইন করছে Zynga নামের একটি কোম্পানি। এ গেমগুলো খুবই সরল, ধারণাগত দিক থেকে উঁচু মানের, কিন্তু এগুলো সামাজিক। Farm Ville-এ আপনি ভিজিট করতে পারেন আপনার বন্ধুর ফার্ম। Mafia Wars– আপনি হিট করতে পারবেন আপনার বন্ধুর ওপর। বর্তমানে 'মাফিয়া ওয়ার্স' গেমের খেলোয়াড়ের সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লাখ। আর 'ফার্ম ভিলি'র খেলোয়াড় সংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লাখ। চার বছর বয়েসি Zynga কোম্পানির বিনিয়োগ মূল্য ৫৪০ কোটি ডলার। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গেম পাবলিশার কোম্পানি Electronics Arts-এর চেয়েও এই বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি।

ফেসবুক বাজারের চেয়ে বড় কিছু দখল করতে বসেছে। এমনকি আপনি যদি ফেসবুকে নাও থাকেন, তবুও ওয়েবের এখানে-সেখানে এর ছাপ লক্ষ করে থাকবেন। ওয়েবসাইটগুলো আপনাকে আজকাল আহ্বান জানাচ্ছে সেগুলোতে লগ অন করার জন্য, ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে– নিউইয়র্ক টাইমস, ইউটিউব, মাইস্পেস ইত্যাদি তা করছে। আপনার ফেসবুক মেম্বারশিপ যেনো হয়ে উঠছে এক ইন্টারনেট পাসপোর্ট: আপনার আইডেনটিটি ভেরিফাইয়ের এক টুল।

বিশ্বে প্রতি ১২ জনে একজন এখন ফেসবুকের সদস্য। ফেসবুকের সদস্যসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। চলতি বছরে এ নেটওয়ার্কের সদস্যসংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়ালো। এরা কথা বলে ৭৫টি ভাষায়। এরা সম্মিলিতভাবে প্রতিমাসে ফেসবুকের পেছনে খরচ করে ৭০ হাজার কোটি মিনিট। গত নভেম্বরে আমেরিকার প্রতি ৪টি অ্যামেরিকান পেজ ভিউয়ের মধ্যে ১টি ছিল ফেসবুক পেজ ভিউ। বর্তমানে প্রতিদিন সদস্যসংখ্যা বাড়ছে ৭ লাখ।

অনেকেই ফেসবুককে মনে করেন সাইটের অ্যাপ্লিকেশন পিকচারে একটু ছুঁ মারা। কিন্তু জুকারবার্গ যা করছেন, তা হলো ইন্টারনেটে কাজের পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনা। ইন্টারনেট সুযোগ দেবে আমাদের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে বেশি থেকে বেশি করে প্রবেশের, জানা যাবে বিশ্বটা কি ও কিভাবে ভাবছে। এখন ইন্টারনেট একটা পতিত জমির মতো। আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন পেজ থেকে পেজে, অন্য আর কেউই সেখানে নেই। জুকারবার্গের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ওয়েব ফেসবুকাইজেশনের পর আপনি দেখবেন ভিন্ন কিছু, যেখানেই আপনি অনলাইনে যাবেন, দেখতে পাবেন আপনার বন্ধুকে। আমাজনে হয়তো দেখবেন আপনার বন্ধুর পর্যালোচনা। ইউটিউবে দেখবেন আপনার বন্ধু কী দেখেছে। কিংবা প্রথমেই দেখবেন তাদের মন্তব্য। এসব পর্যালোচনা ও মন্তব্যগুলো হবে অর্থপূর্ণ, কারণ আপনি জানছেন কে এগুলো লিখেছে এবং এসব লোকের সাথে আপনার সম্পর্ক কী। তাদের রয়েছে একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট।

ফেসবুক জনহীন প্রান্তরকে জনাকীর্ণ করে তুলতে চায়। জীবনের একাকিত্ব কাটিয়ে 'অ্যান্টিসোশ্যাল ওয়ার্ল্ড'-কে রূপান্তর করতে চায় 'ফ্রেন্ডলি ওয়ার্ল্ড'-এ। মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায় আবিষ্কারের ক্ষমতা। ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি কাজ করবেন ও জীবনযাপন করবেন মানুষের এক নেটওয়ার্কের আওতায় থেকে, আপনি কখনো একাকিত্বে ভুগবেন না।

ফেসবুকের অফিসের দখলে দুটি অফিস ভবন, মাঝখানে মাত্র কয় মিনিটের পথ। বাইরের দিক থেকে এগুলো নিষ্ঠুর কংক্রিট বাঙ্কার। ভেতরে এগুলো সজ্জিত পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিলিকন ভ্যালি স্টাইলে– উঁচু সিলিং, কংক্রিটের মেঝে, থামগুলো ইস্পাতের এবং প্রচুর জানালা। রয়েছে একটি বড় আকারের সাদা বোর্ড। Chuck শব্দটি স্লে-গান হিসেবে লেখা রয়েছে অফিসের ভেতরে সর্বত্র। ফেসবুকের সবাই অন্য কোথাও ছিলেন এক-একজন তারকা। যেমন টেলর নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই টিমের, যারা সৃষ্টি করে 'গুগল ম্যাপস'। ফেসবুকে যারা চাকরি করেন, তারা সপ্তাহে পাঁচ– দিনে তিনবার ভালো খাবার পান বিনামূল্যে। সাথে যখন-ইচ্ছে স্ন্যাকস, ফ্রি-ড্রাই ক্লিনিং সুবিধা। তবে ভুললে চলবে না মূল আকর্ষণ জুকারবার্গের ভিশন। জুকারবার্গ এখন চেষ্টা করছেন ফেসবুকের ওপর মাইক্রোসফট ধরনের ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে। কারণ, প্রচুরসংখ্যক ইউজার যোগ হওয়ার সাথে সাথে ফেসবুক প্রচুর অর্থও আয় করছে। ইউজার বাড়ানোর জন্য অবদান জুকারবার্গের, কিন্তু অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে বড় অবদান শেরিল স্যান্ডবার্গের।

একচল্লি-শ বছর বয়েসী শেরিল স্যান্ডবার্গ ফেসবুকে আসেন ২০০৮ সালে। এর আগে তিনি পরিচালনা করতেন গুগলের বিজ্ঞাপন ব্যবসায়। তারও আগে এই মহিলা ছিলেন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের 'লরেন্স সামার্স'-এর চিফ অব স্টাফ। সামাজিক, প্রযুক্তিক ও দর্শনগত জটিলতার কারণে ফেসবুকের অর্থ উপার্জনের একমাত্র প্রধান উপায় হচ্ছে বিজ্ঞাপন। স্যান্ডবার্গের আসার আগে জুকারবার্গ ব্যবসায়ের এ অংশটি ধীরে ধীরে বিকশিত করছিলেন। তিনি ব্যানার বিজ্ঞাপন সেল করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলেন। তিনি মনে করতেন বেশিমাত্রায় অন্যায়ভাবে জোর করে বিজ্ঞাপন ঢোকালে সাইটটির পার্সোনাল ফিল বাধাগ্রস্ত হবে। সেজন্য তিনি পেজের এক পাশে আয়তাকার স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে আসছিলেন। ফেসবুক এখনো ব্যানার বিজ্ঞাপন সেল করে না। তবে স্যান্ডবার্গ A-list বিজ্ঞাপনদাতাদের একটা রোস্টার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন Nike, Vitamin Water, Louis Vuitton-এর বিজ্ঞাপন।

ফেসবুক একটি প্রাইভেট কোম্পানি। এর আর্থিক বিবরণী প্রকাশের কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু স্যান্ডবার্গের সুদৃঢ় আস্থার সাথে ঘোষণা: 'আমি মনে করি, এমনটি বলা পুরোপুরি যথার্থ যে, ফেসবুক একটি সুস্থ ব্যবসায়, ভবিষ্যতে নয়, এখনই এটি একটি ভালো ব্যবসায়। জুকারবার্গ স্থির নিশ্চিত, ফেসবুক লাভজনক, শুধু টেকনিক্যালি নয়। এর নগদ-প্রবাহ ইতিবাচক। বিশে-ষক ও সাংবাদিকেরা কম জানেন কিন্তু বলেন বেশি। তাদের অনুমিত হিসাবমতে ফেসবুকের ২০১০ সালের রাজস্ব আয় ১১০ কোটি থেকে ২০০ কোটি ডলার।